ছেঁটে ফেলার নিঃশব্দ রাজনীতি

সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে একই রাজনৈতিক দল (এবং তার নেতৃত্বাধীন জোট) একনাগাড়ে একত্রিশ বছর রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকায় এবং সেই দলের গণভিত্তি ক্রমে সঙ্কীর্ণ অর্থে ক্যাডার ভিত্তিতে পরিণত হওয়ায়, রাজ্যে শাসক দল যে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে এ ব্যাপারে কোনও সচেতন মানুষের দ্বিমত থাকার আর বোধহয় কোনও অবকাশই নেই। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, শাসকরা যেভাবে একদিকে নিজেদের বলে ও প্রশাসনের মধ্যেকার গণতন্ত্র সম্মত সীমারেখাকে মুছে দিয়েছে আর অন্যদিকে দল যেভাবে পৌর সমাজের সমস্ত সাংস্কৃতিক সাংগঠনিক ক্ষেত্রগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা ও লোকবল দিয়ে আত্মসাৎ করেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে ফ্যাসিবাদের ছায়া দেখা অমূলক নয়। প্রচণ্ড ক্ষমতার আশ্বাসেই তীব্র সমালোচনা ও গণপ্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে শাসক দল অবলীলায় নন্দীগ্রামে 'সূর্যোদয়' ঘটিয়েছে, প্রশাসনকে প্রহসনে পর্যবসিত করে এবং দলীয় ক্যাডারদের হাতে আইনরক্ষকের ক্ষমতা দিয়ে। নিজেদের স্বঘোষিত মার্ক্সবাদে নিয়মিত ফুলবেলপাতা দিয়েও এই দল নির্দ্বিধায় একচেটিয়া পুঁজির জয়রথকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেছে এবং এই সিদ্ধান্তের পক্ষে চতুর যুক্তিচয়নও করেছে। এভাবে দলটা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের সহায়ক হয়ে ওঠায় সচেতন মানুষের চোখে ফ্যাসিবাদের ছায়া আরও নিবিড় হয়ে ধরা দিচ্ছে। এই অবস্থায় রাস্তাঘাটে কান পাতলেই সাধারণ মানুষের একান্ত আলাপচারিতায় এই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও এমনকি ঘৃণার নির্ভুল উচ্চারণ প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্তরে একটা নৈরাশ্যের রেশও ব্যাপকভাবে শুনতে পাচ্ছি। তাদের অধিকাংশের বক্তব্য যে শাসকদল হিসেবে সি পি এম সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে এত সফল হয়েছে যে আগামী দিনে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার সাহস পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের নেই।

এই পরিস্থিতিতে এখন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাশীল মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ মত দানা বেঁধে উঠেছে যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন ও পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের পাশাপাশি এইসব ইস্যুকে ভিত্তি করে সে পৌরসমাজের আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার মধ্যেই নিহিত আছে পট পরিবর্তনের চূড়ান্ত সম্ভাবনা। মনে করা হচ্ছে, গত শতকের সত্তরের দশক থেকে নয়া

যে অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে গিয়ে গণসংগঠনের জলকাদা মাখেন, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মাপকাঠিতে তাদের কাজ পার্থিবতার ভারে স্থূল। তুলনায় ক্ষুরধার বৌদ্ধিকতা কেবল সূক্ষ্মতার দ্যুতিই ছড়ায় না, বুদ্ধিজীবীকে এক অনাসক্ত 'মুক্ত পুরুষ' গোছের ভাবমূর্তি দেয়, যা আবার বহু বাঙালি, হিন্দু মধ্যবিত্তের সুপ্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষকেও তৃপ্ত করে।

সামাজিক আন্দোলনগুলির অন্যতম হিসেবে পশ্চিমে যে পৌরসমাজের আন্দোলন মাথা তুলেছিল, এই আন্দোলনের ঢেউ এবার যথার্থভাবে পশ্চিমবঙ্গেও এল। এমনও অনেকে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে এই পৌরসমাজের আন্দোলনের একটা বড় ইতিবাচক দিক হল তার ''রাজনৈতিকতা'। বিশেষত গণমাধ্যমের একাংশ দাবি করছে যে এই বিশেষ গুণই নাকি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের তুলনায় উৎকৃষ্ট করেছে।

গত দেড় বছর ধরে 'সিঙ্গুর - নন্দীগ্রাম - রিজওয়ানুর'কে কেন্দ্র করে নাগরিক তৎপরতাকে পৌরসমাজের আন্দোলনই বলি আর যাই বলি তার অবদান অনস্বীকার্য। বলা যেতেই পারে যে গত দেড় বছরে বহু কৃষকের দুর্দশা, মৃত্যু ও নির্যাতনের বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তির ঝুলিতে তবুও যা জমতে পেরেছে, তার একটা অবশ্যই এই অভূতপূর্ব নাগরিক তৎপরতা। অন্তত বিগত বছর কুড়ি যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক জীবন যেভাবে মিইয়ে গিয়ে আনমনা হয়ে সরকারি মেলা মহোৎসবে বেনফিশ খেয়েই নিজেকে কৃতার্থ মনে করত, সেই অনুপাতে গত এক-দেড় বছরে নাগরিক সক্রিয়তায় জোয়ার এসেছে বলা চলে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, প্রসাসনিক দুর্নীতি এবং শাসকদগলের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এই নাগরিক তৎপরতার যে দিকটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তা হল রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে এই তৎপরতার দানা বেঁধে ওঠা। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে সঙ্কীর্ণ দলদাসত্বের ঊর্ধ্বে উঠে নাগরিক আত্মপরিচয়ে এই মুখর হয়ে ওঠার তাৎপর্য অপরিসীম। গত তিরিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সিপিএম নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় থাকায় দলীয় রাজনীতির ভেলা তার হারজিতের দ্বন্দ্ব - ছন্দহারিয়ে দলতন্ত্রের জগদ্দল পাথরে পর্যবসিত হয়েছে। শাসকদলের সদর দপ্তর থেকে দলের সাধারণ সম্পাদকের জবানীতে প্রশাসনিক ঘোষণা শুনতে আজকাল আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই অবস্থায় দলমত নির্বিশেষে ইস্যু ভিত্তিক নাগরিক জমায়েত গড়ে ওঠা এক প্রতিষেধকের কাজ করছে বৈকি। তাছাড়া, এই যে সাংস্কৃতিক জগতের বেশ কিছু স্বনামধন্য মানুষ, যারা বিগত তিরিশ বছর বামফ্রন্ট সরকারের 'সদিচ্ছা' সম্বন্ধে আশ্বস্ত থেকেও হঠাৎ সমালোচনার চশমা চোখে চড়াতে পেরেছেন আর এই যে গণমাধ্যমের দৌলতে তাদের বক্তব্য তারকার দ্যুতি গায়ে মেখে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছে এরও একটা সচেতক ভূমিকা আছে। কোনও দলীয় পতাকা এবং দলীয় শ্লোগান ছাড়া যে মিছিল হতে পারে, এবং ঘন ঘনই হতে পারে, তা চমকে উঠে হঠাৎই জানল কলকাতা। মহাকরণ থেকে গেরস্থের রান্নাঘর পর্যন্ত বিছানো শাসক দলের আধিপত্যে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যে প্রশ্নহীন অসহায় দল-নির্ভরতা অন্তত দু'দশক ধকে গেড়ে বসেছিল, তাতে চিড় ধরেছে; রাজনৈতিক দলের পরিচয়পত্র না নিয়ে কেবল নাগরিক

পরিচয়েই যে গণতন্ত্রের রাজপথে মাথা তুলে চলাফেরা করা যায়, আওয়াজ তোলা যায়, সেই বোধটা সাধারণ্যে ধীরে হলেও উদয় হস্তে। উন্নয়নের নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষিজমি অধিগ্রহণ ও SEZ স্থান ও খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি আবাহনের যে নীতি গ্রহণ করেছে তা কতটা ন্যায্য বা প্রয়োজনীয় তা জানার একটা তাগিদ ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে; এবং বর্তমান পৌরসমাজের আন্দোলনের একটা বড় কাজই হয়েছে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এইসব প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দেবার চেষ্টা করে। এই প্রয়াস প্রায় অভূতপূর্ব। দু'বছর আগেও এ ধরনের প্রয়াস কতিপয় নাগরিক সংগঠনের মধ্যে সীমিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন কতটা বিপর্যস্ত এবং কেন, তা নিয়েও পৌরসমাজের এই আন্দোলন বিভিন্ন গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে আলোচনা চালাচ্ছে। আমুল সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপারে আইনের শাসনের ভূমিকা সীমিত হলেও, আইনের শাসনের অভাবকে বার বার চোখে আঙুল দিয়ে তুলে ধরা কিন্তু ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে এক কার্যকরী পন্থা।

কিন্তু তবুও বিশুদ্ধ পৌরসমাজের আন্দোলনই পশ্চিমবঙ্গে নব্য ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটাবে এটা আশা করতে গিয়েও মনে দস্তুরমতো খটকা লাগছে। সিঙ্গুরে কৃষিজমি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেবার পর জমি দিতে অনিচ্ছুক অসংখ্য কৃষকের স্বার্থে লড়ার পথ পৌরসমাজের সামনে আর নেই; মনে হচ্ছে প্রতিবাদ ও সমালোচনার যে আইনসম্মত, শৃঙ্খলাপরায়ণ আঙ্গিকগুলো পৌরসমাজের বৈশিষ্ট্য তার পুরো চালচিত্রটাই নিঃশেষ করে ফেলেছে এই নাগরিক আন্দোলন। পৌরসমাজের আন্দোলন দাবি করতে কসুর করেনি রিজওয়ানুরের মৃত্যুর পিছনে সরকারের মদতপ্রাপ্ত পুলিশ - পুঁজিপতি গাঁটছড়াই সক্রিয় ছিল, কিন্তু দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার অব্যর্থ উপায় পর্যন্ত তাদের হাতে নেই। আবার সরকারি মদতে অতিজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশকে — স্থানীয়ভাবে হলেও — রুখেছে নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন, পৌরসমাজের আন্দোলন নয়। নন্দীগ্রামে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পৌরসমাজের সেতু ভেঙে পুলিশ প্রশাসনকে রুখে রাস্তা কেটে, সেতু ভেঙে পুলিশ প্রশাসনকে রুখে দেওয়ার হিম্মত পৌরসমাজের আন্দোলনের ছিল না।

অথচ এই পৌরসমাজের আন্দোলন প্রচণ্ড প্রত্যাশা তৈরি করেছে গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস ওঠা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে। যেমন সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিক সম্পাদকের কাছে লেখা এক পাঠকের চিঠিতে রাজনৈতিক পালাবদলের আর্তির পাশাপাশি 'স্বজন' নামক এক নাগরিক সংগঠনের কাছে আকুল আবেদন জানানো হয়েছে যে তার যেন সিপিএমের তিরিশ বছরের অপশাসনের অবসানের জন্য গ্রামে-গঞ্জে সংগঠন গড়ে তোলেন। এখন প্রশ্ন হল, জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণের ক্ষমতা বা আগ্রহ পৌরসমাজের আছে কিনা।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমূল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু সম্ভাবনা আছে বলে বোধহয় কোন সমাজবিশ্লেষকই মনে করেন না। কাজেই শীঘ্র পট পরিবর্তন প্রত্যাশা করলে তা সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনী পথে আসবে বলেই মেনে নিতে হয়। কিন্তু এই দলীয় রাজনীতিতে কতটা আর কী ভূমিকায়ই বা জড়াবে পশ্চিমবঙ্গের পৌরসমাজ?

'স্বাভাবিক নেতৃত্বের' দায়

বর্তমান পৌরসমাজের আন্দোলনে নিবিড় অংশগ্রহণ করেছেন এমন অনেকের মুখে যা শুনছি তাতেই আমার প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। তাঁরা প্রবলভাবে চাইছেন শাসকদলের পতন, অথচ, নৈরাশ্যের সঙ্গে বলছেন যে কোনও 'সুযোগ্য' বিরোধী দল নেই,। অর্থাৎ, তাঁরা পথ চেয়ে আছেন এক কল্পিত 'সুযোগ্য' দলের, কিন্তু সুযোগ্য বিরোধী দল তৈরিতে কোনও প্রত্যক্ষ অনুঘটকের ভূমিকা পালনেও তাঁরা অনিচ্ছুক। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বারবারই তাঁদের মধ্যে থেকে উঠে আসছে যে তাঁরা যেহেতু পৌরসমাজের সদস্য তাই তাঁরা 'অরাজনৈতিক'।

এই বক্তব্য থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট: এখানে পৌরসমাজকে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই জনগোষ্ঠী তাদের দ্বারা গঠিত যাদের নির্বাচনে মতদান ছাড়া দলীয় রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্রব নেই, কোনও এক মৌলিক কারণে নাকি থাকতেও পারে না। আর অবশ্যই আনুষঙ্গিকভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে পৌরসমাজ আর রাজনৈতিক সমাজ দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে একটা খাড়াখাড়ি, অলঙ্ঘ্য, বাস্তব বিভাজন রেখা আছে।

নানা ধরনের সংগঠনের মধ্যে প্রাণ পেলেও, পৌরসমাজ কিন্তু আসলে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোনও জনগোষ্ঠী নয়। এটা আসলে মূলত একটা ধারণা যার সংজ্ঞা নিয়ে আবার যথেষ্ট বিতর্ক আছে। পৌরসমাজের নানা বিবদমান সংঘের মধ্যে দিয়ে কোনও ন্যূনতম সর্বসম্মত উপাদান থাকে তা হল এই যে পৌরসমাজ মূলত এক ধারণাগত ক্ষেত্র, যা ধারণা হিসেবেই রাষ্ট্রের ধারণা থেকে ভিন্ন। নাগরিক অধিকারের বিমূর্ত ক্ষেত্র হিসেবে পৌরসমাজের ধারণাকে মূলত একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে একটা বাঞ্ছিত সীমারেখার মধ্যে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে। রাজনীতি এবং পৌরসমাজের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য বিভাজন আছে বা পৌরসমাজের কাছে দলীয় রাজনীতি অস্পৃশ্য ইত্যাদি বক্তব্য আদৌ কোনও আপ্তবাক্য নয় এবং সর্বজনস্বীকৃত নয়। বরং যথার্থভাবে বলতে গেলে, পৌরসমাজের ধারণার নির্মাণ নির্ভর করে কোন পরিস্থিতিতে কোন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এই ধারণাকে হাতিয়ার করে শব্দটিতে কী অর্থ সঞ্চার করতে চাইছে তার উপর।

অতএব ভেবে দেখা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আজ কারা নিজেদের বক্তব্যকে পৌরসমাজের কণ্ঠস্বর বলে উপস্থাপিত করেছে— যাদের জীবনদর্শনে কিনা পৌরসমাজের ক্ষেত্র কেবল রাষ্ট্রের থেকেই ভিন্ন নয়, দলীয় রাজনীতিরও সবরকম সংস্রব বিবর্জিত, এমনকি যে কোনওরকম রাজনীতিরই লেশরহিত। গত এক-দেড় বছরে সিঙ্গুর - নন্দীগ্রামে কৃষকদের আন্দোলনের পাশাপাশি যে শহুরে মানুষজন সরকারের সমালোচনায়

মুখর হয়েছেন তাঁদের সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যদি কোনও একটি সাধারণ অভিধায় নির্দিষ্ট করা যায় তাহলে তাঁদের বুদ্ধিজীবীই বলতে হয় কারণ এইভাবে পরিচিত হতে তাঁদের অধিকাংশই পছন্দ করেন এবং শিক্ষিত বাঙালি সমাজও তাঁদের এই শব্দের সাহায্যেই চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। প্রত্যেক জীবিকাতেই বুদ্ধির প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও যে বিশেষ শ্রেণিক মানুষকে বেছে নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বুদ্ধিজীবী বলে চিহ্নিত করে, সেই শ্রেণীর আত্মপরিচয় বা সামাজিক অবস্থানকে ইংরেজি intellectual শব্দটি দিয়ে নির্দিষ্ট করা কিন্তু অনৈতিহাসিক। বুদ্ধিজীবী শব্দে যে বিশেষ মাত্রা প্রবলভাবে উপস্থিত তা হল কায়িক শ্রম থেকে বাঙালি শিক্ষিতসমাজের সযত্নে ললিত দূরত্ব। বৌদ্ধিকতা (intellectuality) নয়, বুদ্ধিকে (Intelligence) এমনভাবে কায়িক শ্রমভিত্তিক জীবিকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তসুলভ জীবিকার সঙ্গে সমীকৃত করে বুদ্ধিজীবী অভিধাকে বাঙালি মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সবচেয়ে ইপ্সিত সামাজিক পরিচয় হিসেবে লালন করার এক গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, যা অনেকাংশে বাঙালি মধ্যবিত্ত নিহিত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফসল। এই শ্রেণির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনও অধিনায়কত্ব ছিল না, না ছিল শাসনব্যবস্থা তাদের হাতে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে চেতনার উন্মেষ কালক্রমে এই শ্রেণিকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে; ব্যক্তিগতভাবে বহু বাঙালি ভদ্রলোকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনস্বীকার্য অবদান আছে, এমনকি আছে অসামান্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ও। আবার অন্যদিকে শ্রেণিগতভাবে সেই জাতীয়তাবাদের যুগ থেকেই এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আধিপত্যের বাসনার নির্ভুল পদসঞ্চার ঘটে; আধিপত্য অবশ্যই দেশের নিম্নবর্গের জনগণের উপর। আধিপত্যের এই বাসনাকে রূপায়িত করার একমাত্র অবলম্বন ছিল 'ভদ্র' ও 'শিক্ষিত' হিসেবে এই শ্রেণির সামাজিক কৌলিন্য। আধিপত্যের দাবিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিজের কাঁধে জাতির 'স্বাভাবিক নেতৃত্বের' দায় তুলে নেয়। কাজেই অনুমান করা যায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির অগ্রণী অংশের 'বুদ্ধিজীবী' অভিধায় ভূষিত হয়ে ওঠা অনেকাংশেই এই নেতৃত্বের দাবিকেই জোরদার করে। ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা 'মেয়েলি', 'দুর্বল' হিসেবে চিহ্নিত এই শ্রেণী শারীরিক দুর্বলতার এই অভিযোগকে কার্যত স্বীকার করেই বুদ্ধিজীবী তক্‌মার মধ্যে—ও বুদ্ধির প্রখরতার মধ্যে আর — এক পরিবর্ত পৌরুষ খুঁজে নেয়। তবে এই শ্রেণিকে এবং তার বড় সাধের বুদ্ধিজীবী তক্‌মাকে বুঝতে গেলে আরও একটা শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বোঝা জরুরি।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলিত এবং ঔপনিবেশিক বাচনে হীন প্রতিপন্ন এই শ্রেণির মধ্যে একটা বিদ্রোহী প্রবণতা অনিবার্যভাবে দানা বাঁধে। এই প্রবণতা স্বাধীনতার পরও ইন্ধন পেয়েছে কারণ বাংলাকে ছেড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্র তর্কাতীতভাবে ভারতের অন্যত্র সরে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জুটেছে কেন্দ্রের অমনোযোগ। আবার অন্যদিকে আজন্ম ভদ্রতার আদর্শে লালিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি চেতনায় দীক্ষিত এই জনগোষ্ঠীর জন্মলগ্ন থেকে রয়েছে গণআন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর অস্বস্তি, হয়তো বা ভয়ই। তাই গণআন্দোলনের বিদ্রোহী আঁচ নিতে গিয়েও ইতিহাসে বহুবার জনগণের 'মেঠো' আন্দোলনের উপর নিজের 'ভদ্রতা'র 'মাত্রাবোধ' -এর স্বাক্ষর দিয়ে পরিস্থিতিকে নিজের নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে এই শ্রেণি।

শ্রেণি হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্তের কলেবর, পরিধি ও অনেক খুঁটিনাটি সেই ঔপনিবেশিক কাল থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু গণআন্দোলন সম্বন্ধে এই বিশেষ মনোভঙ্গি এখনও মূলত একই রয়ে গেছে। আবার মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের কিরীট হিসেবে যদি বুদ্ধিজীবী অভিধার কথা বলি, তাহলে সেখানে আরও একটি বিশেষ মনোভাবও কাজ করে। যেহেতু বিদ্যাবুদ্ধিতে শান দেবার মধ্যেই বাঙালি মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের যাথার্থ্য, তাই চিন্তা ও তাত্ত্বিকতার বিমর্ত জগৎকে প্রতাপান্বিত করে বুদ্ধিজীবী মহল কাজের জগতের জড়তার ঊর্ধ্বে তাকে স্থান দেয়। তাই যে অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে গিয়ে গণসংগঠনের জলকাদা মাখেন, বাঙালি বুদ্ধিবীবীর মাপকাঠিতে তাদের কাজ পার্থিবতার ভারে স্থূল। তুলনায় ক্ষুরধার বৌদ্ধিকতা কেবল সূক্ষ্মতার দ্যুতিই ছড়ায় না, বুদ্ধিবীবীকে এক অনাসক্ত 'মুক্ত পুরুষ' গোছের ভাবমূর্তি দেয়, যা আবার বহু বাঙালি, হিন্দু মধ্যবিত্তের সুপ্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরুষকেও তৃপ্ত করে।

দুটি অভিজ্ঞতা

এবার মধ্যবিত্ততার এই ইতিহাস - নিঃসৃত পাঠকে কতগুলো সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই। আমার দেখা দুটি ঘটনার ভিত্তিতে দেখাতে চাই যে কার্যক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পৌরসমাজের আন্দোলনের সীমানা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনার দ্বারাই সীমিত এবং বুদ্ধিজীবীই হচ্ছে এই আন্দোলনের আইকন, জনগণ নয়।

নন্দীগ্রামের গণহত্যার পটভূমিতে ২০০৭ -এর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পালনের নৈতিকতা নিয়ে অহিংস বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিলেন সংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু মানুষ। নন্দন চত্বর থেকে ফৌজদারি আইনের ১৫১ ধারায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। সেইদিনই নন্দন চত্বরের আশপাশের অঞ্চল থেকে একই বিষয়ে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য একই ধারায় গ্রেপ্তার হন কিছু গণসংগঠনের জনাকয়েক কর্মী। লালবাজারে সেন্ট্রাল লকআপে সংস্কৃতি জগতের বুদ্ধিজীবীরা, যাদের অধিকাংশই চলচ্চিত্র, নাটক ও ছোট পর্দার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত এবং সেই হিসেবে যুগপৎ 'বুদ্ধিজীবী' এবং 'তারকা', নিজেদের মধ্যে আলাপ করেই আটকের সাড়ে চার ঘন্টা পার করে দিলেন। কিন্তু গণআন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করার কোনও আগ্রহই তাঁরা অনুভব করলেন না, যদিও শেষোক্তরাও একই লকআপে চৌহদ্দীতে বুদ্ধিজীবীদের গা ঘেঁষেই বসেছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের একান্ত আড্ডায় মৌচাক বেঁধে চর্চিত ঔদাসীন্যে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন স্বপ্না ব্যান্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গণআন্দোলনের কর্মীদের। অথচ যে সিঙ্গুর - নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিজীবীরা সেদিন উৎসব - বিরোধী বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন, সেই সিঙ্গুরের ক্ষেতে - আলে কৃষকদের পাশাপাশি জমি অধিগ্রহণের প্রতিরোধ করতে গিয়ে কিছুকাল আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন স্বপ্না। তাই অবাক হই না যখন 'বুদ্ধিজীবীদের ছাড়াতে' এসে এক বিখ্যাত পরিচালক - অভিনেত্রী

পঁচাত্তর জন্য গ্রেফতার হওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে 'আমাদের লোক' বলে ছেষট্টিজনের তালিকা দেন; সেই ছেষট্টি 'আমাদের' কারণ তারা বুদ্ধিজীবী, বাকিরা যে নিছক গণআন্দোলনের লোক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে কেমন যেন অপরিশীলিত, 'মেঠো' গোছের।

গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৭ আবার বাঙালি মধ্যবিত্তের পৌরসমাজের সীমানাটা এক ঝলক দেখতে পেলাম। গিয়েছিলাম নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি আয়োজিত শহীদ স্মরণে। নন্দীগ্রাম এলাকার সমস্ত গ্রাম উজাড় করে জমায়েত হওয়া মানুষের মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে আন্দোলনকারী কৃষকের প্রতি শ্রদ্ধায় নম্র হওয়ার একটা শিক্ষা হচ্ছিল। কিন্তু গোকুলনগর স্কুলের মাঠে পৌঁছে ছবিটা পালটে গেল। ভেবেছিলাম শহীদদের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ হবে, শহীদদের পরিবারে শোক আর ক্ষোভের বয়ান তাদের মুখ থেকে শুনব, আপোশহীন এক আন্দোলনের কৃষক রূপকারদের পাশে বসে (যদিও পাশে বসার যোগ্যতা আমার একটুও নেই)। কিন্তু দেখতে পেলাম কারা যেন নেপথ্য থেকে কৃষক সংগঠকদের হাত থেকে নিঃশব্দে অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নিলেন। শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে কৃষক সমাজের স্বকীয়তার ছাপের বদলে বসে গেল গত একবছর ধরে বহুবার দেখা বুদ্ধিজীবী সমাবেশের চেনা ছাঁচ —একজনের দ্বারা সভাপতির নাম প্রস্তাব আর একজনের দ্বারা সমর্থন। যদি অশীতিপর লড়াকু কৃষক মহিলা নর্মা শীটকে সভানেত্রী করা হয় তাহলেও বা কথা ছিল। কিন্তু কালো পতাকা হাতে তাঁর দৃপ্ত উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে কলকাতার এক বর্ষীয়ান কবিকে বহুবারের মতো এবারেও এবং এখানেও সভাপতি করা হল। তারপর বুদ্ধিজীবিদেরই কোনও সংগঠনের ইচ্ছায় মঞ্চে নন্দীগ্রামের রক্তমাংসের ছিটেফোঁটাও আর রইল না। গ্রামের ধুলোর ছোপ গালে আর শীতকালের অপ্রতিরোধ্য সিকনি নাকে নন্দীগ্রামের যে পোলাপানরা বেয়াড়াভাবে মঞ্চে উঠে পড়েছিল তারা ধমক খেয়ে দড়ির ওপারের গ্রাম্য জনতার অনামী identity তে বিলীন হয়ে গেল। থলি হাতে ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ এক কৃষককেও মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলা হল। মঞ্চে তখন বুদ্ধিজীবীদের নিরঙ্কুশ উপস্থিতি আর স্কুলের মাঠে দড়ির ওধারে বসে নন্দীগ্রামের হাজার হাজার মানুষ। এমনভাবে মঞ্চে মধ্যমণি হয়ে বসে কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী যে বিবেকের কাছে অস্বস্তিতে পড়েননি তা নয়, কিন্তু তা বলে মঞ্চে উঠতে কেউ আপত্তিও করেননি। অনেক বুদ্ধিজীবী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন বটে নন্দীগ্রামের কৃষকরাই আসল সংগ্রামটা করছেন। কিন্তু মঞ্চে যদি সেই কৃষকরা না থাকেন, যদি দূরে বসে থাকেন কেবল নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকায়, আর বুদ্ধিজীবীরা পান মঞ্চ থেকে সার্টিফিকেট দেওয়ার নৈতিক কর্তৃত্ব, তাহলে নিজেদের সংগ্রামের নায়ক হিসেবে কৃষকদের ভূমিকা আসলে প্রান্তিক হয়ে যায়; অনুষ্ঠানের উপর প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বের স্বাক্ষর।

গণমাধ্যমের সুশীলতা!

এই প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের কথা দিয়ে শেষ করি কারণ এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে প্রশ্ন করারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। পশ্চিমবঙ্গে বহুকাল পরে আজ যখন গণআন্দোলন সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার মূলে নাড়া দিচ্ছে, তখন তার পাশাপাশি গণমাধ্যমে কেন এতটা তৎপররতা দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাকে রেখাপ্পারকম বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখানোর? শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গণআন্দোলনের মধ্যে 'বহুমুণ্ডবিশিষ্ট দানব' -এর ছায়া দেখে বলেই কি বুদ্ধিজীবীর শান্ত, সমাহিত প্রতিমার পিছনে তাকে চাপা দেওয়ার এত আকুলতা গণমাধ্যমে? এমনকি শহর কলকাতায় এক লাখ শহুরে জনতার মৌন ধিক্কার মিছিল দেখেই চিন্তান্বিত গণমাধ্যম ক্রমাগত সেটাকে বুদ্ধিজীবীদের মিছিল বলে চালাতে চেষ্টা করছে।

বহুজাতির গণমাধ্যম সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা এক বৃহদাকার গণমাধ্যম সংস্থা আবার সিভিল সোসাইটি শব্দের আক্ষরিক তর্জমা করে 'সুশীল সমাজ' অভিধার প্রচলনে সচেষ্ট হয়েছে। যখন জমি অধিগ্রহণ বিরোধী গণআন্দোলন প্রকারান্তরে নব্য উদারনীতিকদের আধিপত্যকে চিন্তায় ফেলেছে, তখন সুশীল নাগরিকই তো প্রয়োজন, যারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সম্পত্তি ধ্বংস করবে না, সরকারি দপ্তর পোড়াবে না, শাসক দলের ঘাঁটি জ্বালাবে না, কেবল গভীর আন্তরিকতায় প্রতিবাদের মোমবাতি জ্বালাবে আর কলেজ স্ট্রিটের আনাচে কানাচে চেনা মুখদের নিয়ে ক্রমাগত উন্নয়ন - বিষয়ক সেমিনার করবে। কিন্তু তাদের এই পরিশীলিত বিদ্রোহ পশ্চিমবঙ্গে SEZ গঠন বা সিঙ্গুরে টাটার কারখানা কিছুই হয়তো শেষ পর্যন্ত রুখতে পারবে না। প্রশ্ন জাগে যে এই গণমাধ্যম সংস্থা যখন অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতার চাপে নন্দীগ্রামে পুলিশ - ক্যাডার সন্ত্রাসের ছবি বা জেলায় জেলায় রেশন সংক্রান্ত গণবিক্ষোভের খবর দেখায়, তখন কি একান্ত কাকতালীয় ভাবেই এর পাশাপাশি গ্রামেগঞ্জে 'মাওবাদী' উপস্থিতির নানা 'story' নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে? একটু ঠাহর করলেই বোঝা যায় যে সেই শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের তুলিতেই এই সুশীলতার গণ্ডি টানা। সুশীলতার গণ্ডি টানলে নিঃশব্দে পৌরসমাজের ধারণার বাইরে চলে যায় বহু 'দুঃশীল' ও 'অজ্ঞাতকুলশীল'— বিক্ষুব্ধ মারমুখী জনতা যারা রেশনে ন্যায্য প্রাপ্য না পেয়ে 'আইন ভাঙে', তপসিয়া, রাজাবাজারের দরিদ্র মুসলমান যুবক যারা বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে একমাত্র পরিচয় হল 'লুম্পেন', সেইসব রাজনৈতিক কর্মী যারা হয় 'মাওবাদী', সেইসব রাজনৈতিক কর্মী যারা 'মাওবাদী' নয় 'অসভ্য', খালপাড়ের বাসিন্দা যাদের কোনও 'হক' নেই শহরের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করার, বা ফুটপাতের বাসিন্দা যাদের এই শহরে কেন কোথাও অধিকারের সরকারি নথিপত্র আছে কিনা সন্দেহ। এই নিঃশব্দ ছেঁটে ফেলাই হল 'সুশীল সমাজের' অরাজনৈতিকতার আসল রাজনীতি।